উমর ফারুক ও ইসলামী সমাজ

হাসান জামান

হে ফারুক! ফারুকে আজম।

সাচ্চায়ীর সে খঞ্জর কোথায় তোমার?

দেখি আজ চারিদিকে ঘোরিতেছে কুকাফ-আঁধার!

তোমার খঞ্জর-দীপ্তি এখানে কি জ্বালিবে চেরাগ?

এখানে কি এনে দিবে আজিকার জীবনের আলোক-পরাগ?

-মুফাখখারুল ইসলাম

ভূমিকা

হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফত ইসলামের ইতিহাসে এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও স্মরণীয় অধ্যায়। এ সময়ে সভ্যতার অভিযান যে-ভাবে ও যে-গতিতে পুরাতন জরাজীর্ণ ঘুণেধরা পৃথিবীকে ওলটপালট করে দিয়েছিল তার তুলনা ইতিহাসে বিরল। যে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু হয়েছিল রসূলুল্লাহ (সা)-র আমল থেকে তা হযরত আবূ বকর (রা.)-এর খিলাফতের পর হযরত উমর (রা.)-এর স্কন্ধেই ন্যস্ত হয়। দেশ বিজয়ের সাথে সাথে যে সব নতুন নতুন সামাজিক সমস্যার উদ্ভব হয়েছিল হযরত উমর (রা.)-কে সেই সব সমস্যার মুকাবিলা করতে হয়। তিনি ইসলামের মারফত এগুলোর সমাধান খুঁজেছিলেন; আর তার প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছিলেন সমাজ কল্যাণে। সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে ইসলামী সমাজ দর্শনের পরিপূর্ণ প্রতিষ্ঠা না হলেও সেই মধ্যযুগেও যে এক সুষ্ঠ নৈতিক ও সামাজিক বাস্তব সমাজ-ব্যবস্থার গোড়াপত্তন হয়েছিল তা ইতিহাসের কোথাও খুঁজে পাওয়া কঠিন। খোলাফায়ে রাশেদা বা প্রথম চার খলীফার সম্বন্ধেও একথা বলা চলে তবে সংগঠনের দিক দিয়ে হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতের ভিতরে পাই এক চমকপ্রদ পৌর ও রাষ্ট্র বিজ্ঞানের ইতিহাস। ঐতিহাসিক ওয়েল (Weil) হযরত উমর (রা.)-কে তাই “The Guiding Spirit of Islam” বলে অভিহিত করেছিলেন।

সাম্যের অনুপম বিকাশ

হযরত উমর (রা.)-এর শাসনকালে মানুষে সাম্যের অভূতপূর্ব দৃশ্য চোখে পড়ে। সামাজিক জীবনে প্রতিটি মানুষ মানুষ হিসাবেই বিবেচিত হত সেই সমাজে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক- সব ব্যাপারেই মানসিক মূল্যবোধের অনুপম বিকাশ ঘটেছিল। স্বনামধন্য মুসলিম বীর সেনানায়ক খালিদকে পদচ্যুত করার সময়ে খালেদের পক্ষে জনৈক মুসলিম বিভিন্ন যুক্তি দ্বারা হযরত উমর (রা.)-এর সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের চেষ্টা করেন। হযরত উমর (রা.) সেজন্য তাঁকে তিরস্কার করেন নি। শুধু বলেছিলেন, “ভাই” তুমি তোমার বন্ধুর পক্ষে বলতে গিয়ে আবেগের মোহে পড়েছ।” যখন এক মহিলা বলেছিলেন- “হে উমর আল্লাহকে ভয় কর।”

উপস্থিত আর সবাই যখন তাকে বাধা দিতে গিয়েছিল, খলীফা বললেন, “ওকে বলতে দাও।” তায়েফের সময়ে জাবালার কাপড় মাড়িয়ে দেবার জন্য এক নিরীহ মানুষকে চড় মারবার পালটা শাস্তি হিসাবে খলীফার গালি শুনতে হয়েছিল জাবালাকে। মিসরের শাসনকর্তা আমর বিন আস মসজিদে উঁচু মিনার তৈরির অনুমতি পর্যন্ত পান নি। সামাজিক বিচারে আত্মীয়, অনাত্মীয় শাসক শাসিতকে একই পর্যায়ে ফেলা হত। ‘তোমাদের ভেতরে যে সব চাইতে বেশি কর্তব্যপরায়ণ সে-ই হবে সর্বাপেক্ষা সম্মানিত। --- কুরআনের এই বাস্তব প্রকাশ হয়েছিল তখনকার ইসলামী রাষ্ট্রে ও সামাজে। খলীফা শুধু সংগঠনের মারফতই নয়, নিজের হাতেও সমাজের সেবা করেছেন। আমওয়াছের প্লেগের (১৭১৮ হিজরী) সময় খলীফা নিজেই সাধারণ স্বেচ্ছাসেবকের মত সেবা শুশ্রূষায় রত ছিলেন।

খেলাফতী রাষ্ট্র ও সমাজ

শাসন ব্যাপারে দুটি মন্ত্রণা সভা ছিল। সাধারণ সভায় সব সমস্যার সাধারণ আলোচনা করা হত। এখানে জনগণ তাদের মতামত ব্যক্ত করতে পারত। প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও বিভিন্ন কর্মকর্তাদের নিয়োগ, কর্মচ্যুতি ও অন্যান্য বিশেষ সমস্যার ভার এক একটি কমিটির ওপর ছেড়ে দেয়া হত। মফস্বল থেকে মাঝে মাঝে প্রতিনিধিদল এসে দেশের অবস্থা সম্বন্ধে খলীফাকে খবর জানিয়ে যেতেন ও তাঁদের দাবি-দাওয়া পেশ করতেন। প্রাদেশিক শাসনকর্তার নিয়োগের সময় এদেশের অধিবাসীদের মতামত নেয়া হত। কুফা, বসরা ও সিরিয়ার অধিবাসীরা এই মতামত ব্যক্ত করে শাসনকর্তা নিয়োগের ব্যাপারে শরীক হয়েছিলেন। মাঝে মাঝে শাসন বিষয়ে তদন্ত হত। এই ধরনের এক তদন্তে দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় কুফার শাসনকর্তা সাদকে পদচ্যুত করা হয়েছিল। ব্যবসায়ের নিয়ম না জানায় সেদিন ব্যবসা করা যেতো না। সাধারণ কর্মচারীর বেতন ও খলীফার বেতনে কোনও তারতম্য ছিল না। বিচারালয়ে ছিল শাসক-শাসিতের একই মর্যাদা। উবাই ইবনে কাবের সংগে মোকদ্দমায় খলীফা উমর (রা.) কাযী জায়েদ বিন ইবনে সাবিতের আদালতে হাজির হয়েছিলেন। কাযী যাতে অবিচার না করেন সে বিষয়ে কঠোর দৃষ্টি রাখা হতো। পরিষদের অনুমতি ব্যতীত এতটুকু জিনিসও খলীফা গ্রহণ করতেন না। নিজের শরীরের ক্ষতস্থানে মধু লাগাবার দরকার হলে পরিষদের অনুমতি নিয়ে তারপর অল্প একটুখানি মধু খলীফা গ্রহণ করেন। খলীফা হযরত (রা.) রাসূল (সা.)-এর সালমান নামে এক বিশিষ্ট সাহাবীকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তিনি খলীফা না বাদশা? সালমান বললেন- যদি জোর জুলুম করে জনসাধারণের কাছ থেকে আপনি টাকা-পয়সা আদায় করেন আর বায়তুল মালের টাকা আত্মসাৎ করেন তবে আপনি বাদশা, নতুবা আপনি খলীফা।

বিচার খুব সহজলভ্য ছিল। এ জন্য কোন ফি দিতে হত না। উকিল মোক্তার ছিল না। রাষ্ট্র নিযুক্ত মুফতীরা ‘একতা নামক বিভাগের সাহায্যে জনসাধারণকে আইনের খুঁটিনাটি বিষয় সম্বন্ধে অবহিত করতেন। অমুসলিমের ধর্মেও তমদ্দুনে হাত দেয়া ত দূরের কথা, তাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখবার মত অনুকূল পরিবেশ গড়ে তুলতে তাদেরকে সরাসরি সাহায্য করা হত। জেরুজালেমের পতনের পর সেখানকার খৃষ্টান অধিবাসীদের কোনও জিনিসেই হাত দেওয়া হয়নি--- তাদের বিবেক ও উপাসনার স্বাধীনতাও পুরোপুরিভাবে অটুট রাখা হয়েছিল। ইরাকে শাসনের ব্যাপারে পারসী দলপতিদের ও মিসরের মুকাউকিদের (অমুসলিম) কথা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হত। একজন মুসলিম যতি একজন অমুসলিমকে হত্যা করত তার জন্য এতটুকু ক্ষমা ছিল না। হত্যা করার শাস্তি হিসাবে মৃত্যুদণ্ডই ছিল তার জন্য বিধান।

অমুসলিমের অধিকার

জেরুজালেমের সন্ধি অমুসলিমদের প্রতি মানবিক উদার ব্যবহারের এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। বিজিতের প্রতি এই ধরনের সন্ধি-চুক্তি দুনিয়ার ইতিহাসে বড় একটা নেই। এই সন্ধিতে খৃষ্টানদের জানমাল, গির্জা, ক্রুশ রক্ষিত হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হল। চার্চের উপাসনা বন্ধ করে দেয়া যাবে না, ক্রুশ সরানো যাবে না। কোনও চার্চকে আবদ্ধ পরিণত করা যাবে না। তাদের চার্চের জিনিসপত্রও কোন মতেই নষ্ট করা যাবে না। ধর্ম ও বিশ্বাসের ব্যাপারে তাদের ওপর কোন জোর করা চলবে না। তাদের ওপরে কোনও ধরনের অবিচার ও জুলুম করা চলবে না। খৃস্টান ঐতিহাসিকদের লেখা থেকেই আমরা পেয়েছি যে, তখন খৃষ্টানদের ধর্মগুরু খলীফা উমরকে প্রাচীনকালের দর্শনীয় দালান প্রভৃতি দেখাচ্ছিলেন তখন আসরের নামাযের ওয়াক্ত হয়। তখন তাঁরা ছিলেন কন্সট্যান্টাইনের গির্জার ভেতরে। ধর্মগুরু সেখানেই তাঁকে নামায পড়তে বললেন। কন্সট্যান্টাইনের গির্জায় তাঁর জন্য জায়নামাজের কাপড় বিছানো হয়েছিল। কিন্তু তিনি এই দুই জায়গার কোথায়ও নামায সমাধা করেন নি। “আজ যদি আমি এখানে নামায পড়ি, তবে কাল মুসলমানেরা হয়ত এখানে মসজিদ তৈরির দাবি জানাবে।” এইভাবে তিনি অমুসলিমদের ধর্মীয় স্বাধীনতার পথ সুগম

করে গেলেন।

মুসলিমদের মত অমুসলিমদেরকে দেশ রক্ষার্থে যুদ্ধ করানো তাদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপের শামিল। এ অবস্থায় তাঁরা যুদ্ধ করতে না চাইলে সবল-সুস্থ পুরুষ অমুসলিমের কাছ থেকে জিজিয়া আদায় করা হত। হযরত উমর (রা.) এর আমলে যেসব অমুসলিম মুসলিমের সংগে একযোগে যুদ্ধ করেছিলেন তাদের জিজিয়া দিতে হয় নি। জর্জান ও বাব নামক স্থানদ্বয়ে অমুসলিমদের নাম এই প্রসংগে উল্লেখযোগ্য। ইয়ারমুকের যুদ্ধের সময় যখন হিমস নামক জায়গাটা মুসলিম সৈন্য ছেড়ে আসে তখন সেখানকার অধিবাসীদের কাছ থেকে আদায় করা জিজিয়া ফিরিয়ে দেওয়া হয়। কারণ অমুসলিমের রক্ষা করার জন্য যে জিজিয়া নেয়া, সে রক্ষণাবেক্ষণ ত আর সম্ভব হলো না। তাই এই পন্থা অনুসরণ করা হল। সিরিয়া থেকে পশ্চাদপসরণের সময়েও সিরিয়া বিজয়ী আবূ ওবায়দা সিরিয়ার অমুসলিমদেরকে সমস্ত জিজিয়া ফিরিয়ে দেন। ভন ক্রেমার (Von Kramer) বলেনঃ □□অমুসলিম সম্প্রদায়েরা সম্পূর্ণ স্বাধীনতাই ভোগ করতেন।□□ সরকার প্রত্যেক সম্প্রদায়ের হাতে হাতেই তাদের অভ্যন্তরীণ শাসনভার ছেড়ে দিতেন, ধর্ম সম্বন্ধীয় বিচারে ধর্মগুরুগণ কার্যের স্বাধীনতা ভোগ করতেন।

বায়তুলমাল থেকে অমুসলিমেরাও দরকার মত অর্থ সাহায্য পেতেন। এ বিষয়ে মুসলিম ও অমুসলিমে কোনও পার্থক্য ছিল না।

শিক্ষার স্বরূপ

শিক্ষার দিকেও বিশেষ নজর দেয়া হত। ইসলামী ও অইসলামী শিক্ষার ভেতরে কোনও পার্থক্য নির্দেশ করা হত না। কুরআন-হাদীসের নীতির মারফত শিক্ষার্থীর দৃষ্টিভংগি গঠন করে সমস্ত বিষয় অধ্যয়ন করাই ছিল ইসলামী শিক্ষার স্বরূপ। বিজিত দেশগুলিতে ছেলেমেয়ে উভয়ের জন্য শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল। বিজিত দেশগুলিতে শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে শিক্ষক নিযুক্ত করা হত ও তাদের বেতন বায়তুলমাল থেকেই দেওয়া হত। বেদুইনদেরকে বাধ্যতামূলকভাবে কুরআন শিক্ষা দেওয়া হত। শিক্ষার তদারক করার জন্য পরিদর্শক নিযুক্ত করা হত। তাঁরা শিক্ষা সম্বন্ধীয় রিপোর্ট পেশ করতেন। আবু আইয়ুব, আবূ দারদা ও হযরত উবাদা (রা.)-এইসব নামজাদা সাহাবার ওপর শিক্ষা সংগঠনের ভার দিয়েছিলেন হযরত উমর (রা.) নিজে।

ইসলামী সমাজে ভূমি ব্যবস্থা

অর্থনীতির দিকেও খলীফা উমর (রা.) চেয়েছিলেন ইসলামের সামাজিক নীতিগুলির বাস্তবায়ন। ইরাক বিজয়ের পর যেভাবে তিনি ও তাঁর অধীনস্থ শাসকেরা প্রদেশের সর্বাংগীন উন্নতির জন্যে চেষ্টা করতে লাগলেন--- তার ভেতর যেমন একদিকে খলীফার শাসন দক্ষতা, কর্মকুশলতা ও বিচক্ষণতার পরিচয় পাই, অপর দিকে ইসলামের সামাজিক বিধানগুলি আদর্শের উঁচু তলা থেকে বাস্তব সমস্যা সমাধানের পথে নেমে আসে। হযরত আলী (রা.)-র পরামর্শ মত জমি জরিপের ব্যবস্থা করা হয়, খাজনা আদায়ের নতুন উপায় উদ্ভাবন করে চাষীদের নানা প্রকার অসুবিধা রোধ করবার চেষ্টা করা হয়। প্রত্যেক চাষী (অধিকাংশই খৃষ্টান ছিল) যাতে করে জমি পায় সে বন্দোবস্ত করা হয়। জমির উন্নতির জন্যে খাল খনন করা হয়। টাকা দিয়ে সাহায্য করার জন্যে পর্যন্ত শাসকদেরকে নির্দেশ দেওয়া হত। চাষীদের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের খাতিরে জমি বিক্রি বিশেষভাবে নিষেধ করা হয়েছিল।

পারস্য সম্রাটদের বাদশাহী (Croan) জমিজমা, শিকারের বন, খাতক আমীর ওমরাদের জমিজমা, অগ্নি-মন্দিরের পাশের জমি--- এসব রাষ্ট্রের সম্পত্তিতে পরিণত হল; আর মদীনা থেকে নিযুক্ত পরিচালকদের হাতে এর পরিচালনার ভার দেয়া হল।[২] সিরিয়া ও মিসর বিজয়ের পরেও এই একই নীতি অনুসৃত হয়েছিল।[৩] এইভাবে ইসলামের বিজয়ের সংগে সংগে সামন্তবাদের শেষ চিহ্নগুলো ভেঙ্গে পড়লো।

অনেকের এ ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে, □□হযরত রসূল (সা.) ও প্রথম দুই খলীফা জায়গীর প্রথা সমর্থন করেছেন। □□আরবের বাইরে জমি কিনতে দেওয়া হতো বা চুক্তির ভিত্তিতে ইজারা (কাতাই) দেওয়া হত। উমর এইসব বেশি না দিলেও তার পূর্ববর্তীরা দিয়েছিলেন, দেশের শত্রু ছাড়া অন্য সব জমিদার স্বীকার করেছিল।□□[৪] কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই বর্ণনা নির্ভুল নয়। খলীফা উমরের পরবর্তী যুগে এটা হয়েছিল সত্য, কিন্তু প্রথম দুই খলীফার আমলে বরং উল্টোটাই ঘটেছিল। সৈনিক বা সাধারণ নাগরিক কাউকেই বিজিত বেশে জমি ভোগ করতে দেওয়া হয়নি। ভন ক্রেমার, গোল্ডজিহার ও ওয়েলহাইযেনের গবেষণা থেকেই আমরা এটা স্পষ্টভাবেই পাই।[৫]

কোন মুসলিমকেই বিজিত দেশে জমি কিনে জায়গীর গড়ে তুলতে দেওয়া হয়নি। চাষীদের ওপর কোনও দিক থেকেই যাতে অত্যাচার করা না হয় সেদিকে কঠোর দৃষ্টি রাখা হত। আর যেসব জমি যুদ্ধের ফলে দখলে আসত সেগুলি বায়তুলমালের সম্পত্তি হিসেবে সমগ্র ইসলামী সমাজের পক্ষ থেকে পরিচালনা করা হত ও তার মঙ্গলার্থে নিয়োগ করা হত। ফলে বিজিত দেশে বিজয়ী

মুসলমানদের এক ইঞ্চি পরিমাণ জমিও ছিল না। যাইদ বিন সাদ নামে এক মুসলিম মিসরে জমি কিনেছিলেন। তাকে শেষ পর্যন্ত সে জমি ফিরিয়ে দিতে হয়। কুফাতে তালহা নামে আর এক মুসলিমকে তার ক্রীত নাশতাসাগের জমিজমা হযরত উমরের আদেশে ফিরিয়ে দিতে হয়।

এই নীতির তিনটি ফল আমরা দেখতে পাই। (১) মুসলিম ফৌজদের ভেতরে সংহতি; (২) বিজিত দেশে অমুসলিম কৃষকদের স্থায়ী বসবাস ও জমিতে অধিকার, (৩) কৃষি উন্নতি যার ওপরে শাসন ব্যবস্থার নির্ভর করত। যে সামাজিক নিপীড়নের ভেতরে তারা বাস করতে একে একে তার অবসান হল। জেরুজালেম অধিকারের পর সেখানকার সব দাসকেই মুক্ত করা হয়েছিল। হ্যালাম বলেনঃ পৃথিবীর শুরু থেকে মুহম্মদ পর্যন্ত যে শোচনীয় অবস্থায় এই সব বিজিত জাতিরা বাস করতে তার থেকে ইসলাম তাদের মুক্তি দিল। আর উম্মথ বলেনঃ Two blades of grass were found growing where one had grown before দেড়শ বছর পরে যখন মুসলমানেরা ক্রুসেড যুদ্ধের ফলে জেরুজালেম পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন তখন প্রাচ্যের খৃষ্টানগণ আরব খলীফাদের উদার শাসনের জন্য আক্ষেপ করেছিলেন।[৬]অমুসলমানেরা পর্যন্ত খলীফাকে এত ভালবাসতেন যে, তার কামিজ পর্যন্ত এক বিশপ নিজ হাতে মেরামত করে দেন।

অধিকৃত সম্পত্তি সবার ভেতরে ভাগ করে দেবার সপক্ষে যুক্তি দিয়ে এক চিঠিতে খলীফা সাদ বিন ওয়াকাসকে লিখেছিলেনঃ যদি তোমরা বর্তমানেই সব ভাগ করে দাও তবে আগামী দিনের মুসলিম কিছুই ভোগ করতে পাবে না। [দেখুন কুরআনঃ আল হাশর (৫৯ ৭-৯)] শাসনকর্তারা যাতে বিশেষভাবে এই নীতি মেনে চলেন, খলীফা সে দিকে কঠোর দৃষ্টি রাখতেন। মিসর বিজয়ী আমর ইবনে আসের অর্ধেক সম্পত্তি ও খালিদের অনেক অধিকৃত মাল রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়।[৭]হযরত উমর (রা.)-এর অধিকৃত জমি থাকায় সেগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত করেন, তারপর যাদের জমি দরকার তাদের ভেতর ভাগ করে দেন।[৮]কারণ জনসাধারণের মঙ্গলজনক কাজে সাহায্যকালে ইমাম বলপ্রয়োগও করতে পারেন।[৯]ইবনে হাজমও এই সমর্থন করেন।

অনেক ঐতিহাসিক হযরত (সা) জায়গীর প্রথা সমর্থন করেন বলে অভিযোগ করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই অপবাদ সত্য নয়। ইহুদীদের কবল থেকে রাষ্ট্রকে বাঁচাবার জন্যে অনেক সময় কিছু কিছু জমি দিয়ে তাদেরকে নতুন জায়গায় সরে বসবাস করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। এই বিশেষ কারণেই খায়বারের যুদ্ধের অধিকৃত সম্পত্তি হযরত (সা) বণ্টন করেছেন। অমুসলিমদের খুশি করা ছাড়া পতিত জমি কৃষির অধীনে আনবার জন্যও কখনও কখনও এ ব্যবস্থা করা হত। কাজেই এতে করে রাষ্ট্রের আয় বাড়ত ও অমুসলিম প্রজাদেরকে সন্তুষ্ট রাখা যেত। কিন্তু এটা সাধারণ নিয়ম ছিল না।৯ক শ্রম ছাড়া জমিতে যে অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় না তা আমরা কুরআন মজিদে (৩:১৩৫, ৫২:৩৯) ও ইমাম আবূ হানীফা ও শাহ ওয়ালী উল্লাহর মতামত থেকেও জানতে পারি।

বায়তুলমাল ও জনগণের অধিকার

হযরত আবূ কবর, হযরত উমর ও হযরত আলী (রা.)-র আমলে বায়তুলমাল কার্যক্ষেত্রে জনগণের সম্পত্তিরূপে বিবেচিত হত এবং ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিটি ব্যক্তি এর থেকে দরকার মত ভাতা পেত।[১০] রাষ্ট্রের আয় বায়তুলমালে জমা হত, সেখান থেকে সবাই সুবিধা ভোগ করত। খলীফার কোনও বিশেষ বেতন থাকত না। সব ধরনের খরচও এর থেকে যোগান হত। ইসলামের নীতিগুলির অন্তর্নিহিত প্রবণতাই হচ্ছে গণতন্ত্র সমাজবাদের দিকে।[১১]

> যাকাত ধনীদের কাছ থেকে আদায় করে গরীবদের দেওয়া হত এবং এটা ছিল বাধ্যতামূলক আইন। ইসলামের প্রথম যুগে সরকারী কর্মচারীর মারফত যাকাত আদায় করা হত ও মসজিদ নির্মাণ, যুদ্ধের খরচ অন্যান্য ভাল কাজে ব্যয় করা হত। (কিন্তু ক্রমে এই প্রথা অচল হয়ে পড়ে ও ব্যক্তির ওপর এই কাজের ভার ছেড়ে দেওয়া হয়।)[১২] অধিকৃত মালও এইভাবে সবার ভেতরে বণ্টন করা হত। যুবক, বৃদ্ধ, স্ত্রী, পুরুষ ও মুক্তদাস সবাই এই সম্পত্তির ভাগ পেত। (বদরে যারা যুদ্ধ করেন-৫০০০ দিরহাম; মুহাজিরিন ও আনসার-৪০০০ দিরহাম, তাদের ছেলেরা-২০০০ দিরহাম; অন্যরা ৬০০/২০০।) অধ্যাপক নোল ডেকে বলেছেন যে, সব চাইতে উল্লেখযোগ্য নীতি ছিল এই যে, যা কিছু অধিকৃত হত তা সামগ্রিকভাবে সবারই হয়ে যেত; তারপর খরচ-খুরচা বাদে যা কিছু থাকত সবই ভাগ করে দেওয়া হত। খলীফা দেখতেন যে, রাষ্ট্রে কোন ভিক্ষুক বা অসহায় ব্যক্তি না থাকে, কেউ কারোর উপর জুলুম না করে। শাসনকর্তারা পদ গ্রহণের সময় বিলাসিতা বর্জনের প্রতিশ্রুতি দিতেন।

এইসব ব্যাপারে মুসলিম ও অমুসলিমে কোন পার্থক্য ছিল না। রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত অমুসলিমেরাও এই সুবিধা পেত।[১৩] মদীনায় এক অন্ধ ইহুদী জিজিয়া দেবার জন্য ভিক্ষা করছিল। হযরত উমর (রা.) তাকে দেখতে পেয়ে বললেন যে, এইসব মানুষের

যৌবনকে কাজে লাগিয়ে বৃদ্ধ অবস্থায় অবহেলা করা সুবিচার নয়। যাকাত গরীব ও অভাবগ্রস্ত লোকদের জন্য, অভাবগ্রস্ত বলতে এদেরেও বুঝতে হবে।□[১৪] গরীব অমুসলিমদেরকে জিজিয়া থেকেও রেহাই দেওয়া হত। কারণ রাষ্ট্রে কোন অসহায় ব্যক্তি না থাকে এটা দেখা ইমামের পক্ষে ফরয। মুর বলেন- একটা বড় জাতি বিজয়ে অধিকৃত সম্পত্তি সাম্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে নিজেদের ভেতরে ভাগ করে নেয়- এমন দৃশ্য দুনিয়ার ইতিহাসে আর চোখে পড়ে না।[১৫]

ইসলামী সমাজ - মানব স্বাধীনতার চরম বিকাশ

সেই মধ্যযুগেও ইসলাম মানব স্বাধীনতার এমন এক অনুপম চিত্রের বাস্তবরূপ দেখিয়েছিল যা আজকের দুনিয়াতেও পুরোপুরি পাওয়া কঠিন। নৈরাশ্যের অন্ধকারে নিমজ্জিত বহু জাতিকে ইসলাম মুক্তির মশাল হাতে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। এর ফলে এমন এক সুসংহত সমাজ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল সেখানে প্রত্যেকের পক্ষেই তার কার্যদক্ষতা দেখিয়ে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করার পূর্ণ সুযোগ ছিল। এই জন্যই সিরিয়ার অধিবাসী, মিসরের কপট উত্তর আফ্রিকার খৃষ্টান □বাববার□ও প্যালেস্টাইনের □সামারিয়গণ□মুসলিম সেনাদেরকে অভ্যর্থনা করেছিল।[১৬] ইসলামের দেয়া মানবিক সাম্য ও সুবিচারের ভাবটুকু সে যুগের শাসকরা বেশ বুঝতে পেরেছিলেন।

মিসর বিজয়ী উমরাও খলীফাকে তাঁর রিপোর্টে জানিয়েছিলেন, কিভাবে মিসরের চাষীরা পিঁপড়ার মত সারাদিন খাটছে, মালিকের বেতের ঘা সহ্য করছে, কিন্তু ফসলের সমান ভাগ ভোগ করতে মুগিরা তার পাশেই বসেছিলেন; এবং এতে উপস্থিত সকলে বিস্ময় প্রকাশ করলে, তিনি বলেন; □□কেউ পূজা পাবার জন্য উপরে সিংহাসনে বসবে আর কেউ নিচে মাথা নীচু করে বসবে আমাদের ভেতরে এ রেওয়াজ নেই। আবার সিরিয়ার দরবারে মুয়াজকে যখন সুদৃশ্য কার্পেটে বসতে দেওয়া হলো, তিনি সেখানে বসলেন না- আর বললেন, □□গরীবদের লুট করে যে কার্পেট তৈরি হয়েছে, সেখানে আমি বসতে চাই না। জেরুজালেমের সন্ধির সময় খলীফাকে তাঁর ছেঁড়া কাপড় ছেড়ে ভাল কাপড় পরতে অনেকে অনুরোধ করে। খলীফা জবাব দেন, □□একজন মুসলিমের সম্মান পোশাকের ওপর নির্ভর করে না।□□

অনাগত সমাজের পথনির্দেশ

কাজেই ইসলামের সামাজিক রূপায়ণ শুরু হয়েও নানা কারণে তার পরিপূর্ণ বিতরণ সম্ভব হল না। এর জন্যে আরও বেশি সময়ের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু খলিফা উমর (রা.)-এর ভাগ্যে তা জোটেনি। ইসলামের নীতিগুলি এমনও সমানভাবে রয়েছে, যে সব কারণে সে সময় তার সর্বাংগীন রূপায়ণ সম্ভব হয়ে ওঠেনি- সেগুলিরই দিকে খেয়াল রেখে আধুনিক জ্ঞান, সামাজিক পরিবেশ ও প্রয়োজনের পরিপূরক হিসাবে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদেরকে আজ এগিয়ে যেতে হবে। মুসলিম হিসাবে ও বুদ্ধিজীবী মানুষ হিসাবে এটা আমাদের কর্তব্য। যাঁরা বুদ্ধির দোহাই পাড়েন- তাঁদেরকেও আমরা ইসলামের সমাজ নীতিগুলি হযরত উমরের খিলাফতের পরিপ্রেক্ষিতে পড়ে দেখতে অনুরোধ করি। এখানে তারা নিশ্চিতভাবে অনাগত সমাজের জীবন গঠনের আশার আলো দেখতে পাবেন।

(সংক্ষেপিত)

1. Arnold: The preaching of Islam. [Also Tabariad Macdonald. Encyclopedia of Islam p. 958-9]

[২] Ameer Ali: The History of Saracens: Macmillan and Co 1951. P. 30.

[৩] ibid : P. 33.

[৪] Bernard lewis: The Arabs in History; Hatchinson`s Univ. Lib. London. 1950. P. 57.

[৫] Khuda Bakhsh: Politics in Islam (1948) P. 22.

[৬] Gibbon-Rise and Fall of the Roman Empire.

[৭] Khuda Bakhsh: Politics in Islam (1948) P. 26.

[৮] Maulana Hifzur Rahman: Islam ka Iktisadi Nizam P. 221. (by courtesy of Prof. M. Azraf)

[৯] Saeedi-at Vol. III. P. 304.

[১০] Ameer Ali: The History of the Saracens (1951). P. 85-6.

[১১] Ibid P. 58-59.

[১২] R. Roberts: The Social Laws of the Qur'an. P. 72.

[১৩] Ameer Ali; The History of the Saracens. P. 59.

[১৪] Abu Ubaid ; Kitab-ul-Awwal. P. 46.

[১৫] Sir William Muir: Annals of Early Caliphate. P. 227.

[১৬] Bemard Lewis: The Arabs in History (1950) P. 58.

সূত্রঃ ইসলামী ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত "উমর ফারুক ও ইসলামী সমাজ" গ্রন্থ

হাসান জামান